International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-VI, May 2015, Page No. 19-26
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নজরুল : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মীর নয়ন
সহকারী শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, সুদপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক), সুদপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Kaji Nazrul Islam was a great poet of Bengali literature in India. He was known as 'rebel poet'. Through literature, journalism and political activism, Nazrul fought against inequality, injustice, exploitation, communalism, imperialism and colonialism. He was a true poet of revolution, equally keen on national liberation of India and removal of exploitation, inequality and injustice from our society. He fulfilled the demand of time and played important role in national movement, specially 'Non- cooperation Movement' led by Gandhi through his writings. He demanded 'full freedom' and could not compromise in this matter. His writings created great excitement among the youths. The freedom fighters were also influenced by his writings. He provided strength, courage, Enthusiasm and inspiration in the heart of depressed people. Every word of his poems and songs dedicated to the workers, farmers and proletarian. He was successful in touching the public mind. He was a poet of people and fearless fighter of our national movement. Therefore, this article tries to analyze the contribution of Nazrul Islam in the context of Non Cooperation Movement.

Key Word: Literature fought, exploitation, depressed, Non-cooperation.

ভূমিকাঃ সাহিত্যিক তথা লেখক, কবি, উপন্যাসিক, নাট্যকাররা যুগে যুগে সময়ের দাবিকে পূরণ করে এসেছেন ।তাঁরা আপন সৃষ্টির উন্মাদনায় মত্ত থাকার পাশাপাশি সমকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা ও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন । তাদের রচনায় ফুটে উটেছে সমকালীন যুগের প্রতিচ্ছবি।তাই সাহিত্য হয়েছে সমাজের দর্পণ। সাহিত্যিকরা শুধু প্রকৃতিপ্রেম ও মানব প্রেম নয়, অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, অসাম্যের বিরুদ্ধে তাদের কলম যেমন প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়েছে, তেমনি বিপ্লবী বা গণআন্দোলনের মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাদের লেখনি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে । বিপ্লবের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, ইতালির কারবোনারি আন্দোলন থেকে আয়ারল্যান্ডের মুক্তি সংগ্রাম, সমস্ত ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের অবাধ বিচরন ছিল। ভারতেও ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে কবি ও সাহিত্যিকরা বলিষ্ঠ ভুমিকা নিয়েছিলেন। যে সমস্ত সাহিত্যিকরা সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে যুবসমাজকে আলোড়িত করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তার রচনা পরাধীন ভারতের যুব সমাজ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে চরম উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল। শৃঙ্খল ভাঙার মন্ত্রে তাদের উদ্বেলিত করেছিল। তার মুখের ভাষা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিল। তার রচনা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বুকে সঞ্চার করেছিল সাহস এবং তাদের বলিয়ান করে তুলেছিল আত্মশক্তিতে। আসলে তিনি যেখানেই দেখেছিলেন অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ , নিপীড়ন সেখানেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক আপোষহীন মানুষ। কোনো কিছুর বিনিময়ে তিনি অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি কোনদিন। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতাপ তাকে ভীত করতে পারেনি। ঔপনিবেশিক সরকারের চোখে তিনি ছিলেন অন্যতম শত্রু। তাই একের পর এক তার কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকার তার প্রতিবাদি কণ্ঠকে দমন করতে পারেনি। যাইহোক নজরুলকে নিয়ে আলোচনা কম হয়নি, আলোচ্য প্রবন্ধে অসযোগ আন্দোলন ও তার ব্যার্থতার পটভূমিতে নজরুলের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে। তিনি কবিতা ও গানের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পরতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আবার আন্দোলনের ব্যার্থতায় সমগ্র জাতির মধ্যে যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল, মানুষ সেই হতাশা কাটিয়ে ওঠার মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল নজরুলের কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে।

নজরুলকে নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই, বিদগ্ধজনেরা তার জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তার জীবনের একটি বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর আদর্শকে বুঝতে গেলে তাঁর মানসিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে বুঝতে হবে, বুঝতে হবে তাঁর আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ শে মে মঙ্গলবার নজরুলের জন্ম হয়। চার পুত্রের মৃত্যুর পর তার জন্ম হওয়ায় নাম রাখা হয় দুখু মিঁঞা। এই নাম তার জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। কারণ সারা জীবন তিনি অন্যের যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন। অন্যের ব্যথায় হয়েছেন ব্যাতিত। যাইহোক, জন্মের কয়েক বছর পরই দুখু মিঁঞার জীবনে নেমে আসে দুঃখের কালোছায়া। আটবছর বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন। পরিবারে নেমে আসে দারিদ্রতার ঘন অন্ধকার। তবে দারিদ্রতা তার পথ রুদ্ধ করতে পারেনি, বরং দারিদ্রতা তাকে

করেছে লৌহকঠিন । তার কথায় 'হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান'। তিনি জীনকে দেখেছেন মাটির খুব কাছ থেকে তাইতো মাটির মানুষদের কথাই তিনি গেয়েগেছেন সারাজীবন ধরে। নজরুলের জীবন নানা ঘটনার ঘনঘটায় সমুজ্জ্বল। জন্ম থেকে মৃত্যু, তাঁর জীবনে উত্থান পতন বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। সময়ের স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে একস্থান থেকে অন্যস্থানে। তাইতো আমরা তাঁকে দেখি লেটোদলে পালা গান রচনা করতে, কখনও আসানসোলে রুটির দোকানে কাজ করতে, কখনও দরিরামপুর হাইস্কুলে, অবশেষে বাংলার মাটিতে সাহিত্যের ফসল রোপণ করতে।

অসহযোগ আন্দোলন, নজরুল ও নবযুগ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নজরুল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। সে সময় থেকেই তিনি কবিতা লিখে কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাঠাতেন। যুদ্ধের পর সরকার বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দিলে ১৯২০ সালে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন। এর পর থেকেই তিনি পুরুপুরি সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। নজরুল যখন সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন তখন দেশ পরাধীন। ব্রিটিশদের শাষন ও অত্যাচারে দেশবাসী অসহায়। সমকালীন এই পরিস্থিতি তাঁর চিন্তার জগতকে আলোড়িত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয়দের মধ্যে একবুক হতাশা জন্ম নিয়েছিল। কারণ, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সমর্থন আদায় করেছিল স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। গান্ধীজী নিজে সরকারকে সমর্থন করার আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে সরকার কথা রাখেনি। স্বায়ত্তশাসনের বদলে তারা ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড' শাসন সংস্কার (১৯১৯ খ্রিঃ)। ঐ একই বছর সরকার 'রাওলাট' আইন পাশ করে ভারতীয়দের ওপর দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে । ফলে দেশবাসির মধ্যে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হতে থাকে । গান্ধীজী পরিচালিত 'রাওলাট সত্যাগ্রহের' মধ্য দিয়ে সেই ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটে। সরকারও এর জবাব দেয় 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকান্ড ঘটিয়ে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯)। এই ঘটনায় গোটা দেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। অপর দিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার তুরুস্কের সুলতান তথা মুসলিম জগতের ধর্ম গুরু খলিফার সম্মান ও ক্ষমতা হ্রাস করে, যুদ্ধে জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করার শাস্তি স্বরূপ । ফলে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতে মুসলিমদের মধ্যে গড়ে ওঠে ব্রিটিশ বিরোধি 'খিলাফত' আন্দোলন। এই পটভূমিতে ভারতিয়দের পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে গান্ধীজী শুরু করেন অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) এবং নজরুল তাঁর কলমের দ্বারা এই আন্দোলনে সঞ্চার করেন প্রাণশক্তি। তারঁ কাছে সময়ের দাবি ছিল অন্যরকম। প্রেম, প্রকৃতি, কিংবা মানব মানবির সম্পর্কের টানাপোড়েন সংক্রান্ত লেখা নয়, এমন লেখা যা জাতিকে উদ্বেলিত করে তুলবে এবং আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করবে। সময়ের দাবিকে তিনি উপেক্ষা করেননি। সময়ের পথ ধরেই তাঁর কলম ছুঠেছে। তাই তিনি বলেছেন

"পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুযুগ কেটে গেলে,
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি,রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো- যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ"।[১]

যাইহোক কলকাতায় আসার পর 'মোসলেম ভারত' ও 'বঙ্গিয় সাহিত্য পত্রিকায়' নজরুলের কবিতা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শিক্ষিত মহলে তাঁর পরিচিতি গড়ে উঠছিল। যদিও তখন বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল নক্ষত্ররা বিরাজ করছেন যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা। শুধু রবিঠাকুর নামক নক্ষত্রটির প্রকাশ ছড়িয়ে আছে আকাশের এক সীমা থেকে অন্য সীমা ব্যাপি। তবুও নজরুল এই নক্ষত্রমন্ডলীর মধ্যে নিজের স্থানটি চিহ্নিত করেছিলেন ।

দেশের এক উত্তাল সময়ে নজরুল সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন। দেশবাসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলনের পথ নিয়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ নজরুলের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি আপোষমুখী আন্দোলনের পথকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ গণআন্দোলন। নজরুল নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার জন্য। মুজফফর আহমদ একবার নজরুলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,এই পরিস্থিতিতে আপনার কর্তব্য কি বলে আপনি মনে করেন? নজরুল পরিস্কার ভাষায় জানিয়েছিলেন –"রাজনীতি যদি না করবো তো যুদ্ধে গিয়েছিলাম কেন?"[২] তিনি আরো বলেছিলেন "আমি রাজনীতিকে সাহিত্যায়িত করবো, কবিতা লিখবো, প্রবন্ধ লিখবো যেমন ভাবে দরকার। আমি গান লিখবো, গান গাইব, মানুষকে গাইয়ে নিয়ে বেড়াব। চারণ হব আমি। ঘুমন্ত মানুষ গুলোকে জাগাতে হলে যতরকমের পথ আছে সব দিক দিয়ে প্রাণপনে চেষ্টা চালিয়ে যাব"।[৩] এই পরিস্থিতিতে নজরুল, মুজফফর আহমদ ও কয়েকজন মিলে একটি বাংলা দৈনিক প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্যোগে 'নবযুগ' নামে একটি পত্রিকা ১৯২০ সালের ১২ জুলাই প্রকাশিত হয়। নজরুলের উদ্দেশ্য ছিল নিপীড়িত মানুষের কথা 'নবযুগের' মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। নবযুগে প্রকাশিত লেখা শিক্ষিত সমাজের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু সরকার বিরোধী লেখা প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ সরকার বেশ কয়েকবার সম্পাদককে সাবধান করে দিয়েছিল। নজরুল রচিত "মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ি কে?"[৪] শির্ষক প্রবন্ধের জন্য সরকার সবচেয়ে বেশি রুষ্ট হয়েছিল। এই প্রবন্ধের মূল বিষয় ছিল, এক দল মুসলিম স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করে আফগানিস্থান চলে যাচ্ছিল, সেই সময় ব্রিটিশ সৈন্য তাদের উপর গুলি চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে। নজরুল ব্রিটিশদের এই অন্যায়ের প্রতি সরাসরি আঙ্গুল তুলেছিলেন। শুধু তাই নয় এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন " আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে"[৫]- এ থেকে বোঝা যায় ব্রিটিশ দের অত্যাচার কবির সহ্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন "স্বাধিনতা ও মনুষ্যত্বকে এমন নির্মম ভাবে দুই পায়ে মাড়াইয়া

চলিবে আর কত দিন"।[৬] নজরুল 'ধর্মঘট' শিরোনামে আরেকটি প্রবন্ধ নবযুগে লেখেন। এখানে তিনি কৃষক, শ্রমিক, মুটে মজুরদের হয়ে সওয়াল করেন। তার কথায় "চাষি সমস্ত বছর ধরে হাড় ভাঙা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ও দুবেলা পেট ভরিয়া মাড় ভাত খাইতে পায় না, হাঁটুর উপর একটা তেনা বা নেংট ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা জীবনে হয়ে ওঠে না, অথচ তাহারই ধান চাল লইয়া মহাজনেরা পায়ের উপর পা দিয়া বার মাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন"।[৭] এই প্রবন্ধে শ্রমিকদের প্রতিও তার সহানুভূতি ব্যক্ত হইয়েছে। তিনি বলেছেন "কয়লা খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেউ ত্রিশ চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচে না,তাহারা দিবারাত্রি খিনির নীচে পাতাল্ পুরিতে আলো বাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায় কেরোসিনের ধুঁয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া ফেলে"[৮]। শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি তার এই সহানুভূতি ছিল স্বাভাবিক। তিনি তাদের যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন চীরকাল। তাই তিনি শোষনের বিরুদ্ধে তাদের ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন "এই ধর্মঘটের আগুন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়, কেননা ভারতেও এই পতিত, উপেক্ষিত, নিপীড়িত হতভাগাদের জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে"[৯]।তার লেখা শ্রমজীবি মানুষদের বুকে সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছিল। ফলে এই ধরনের লেখা যে সরকার বরদাস্ত করবে না সেটাই স্বাভাবিক। ঘটলও তাই।সরকার 'নবযুগের' জামানত বাজেয়াপ্ত করল।

নজরুল কলকাতায় আসার কিছুদিন পরেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। রাজনীতির সঙ্গে তখন তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু দেখা যায় রাজনীতি ও সাহিত্য তাঁর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল অল্প দিনের মধ্যে। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের উত্তাল সময়ে বাঙ্গালির প্রাণে স্বদেশ চেতনার যে ঝড় রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলেছিলেন, ঠিক এই আন্দোলনের পনেরো বছর পর নজরুল বাঙালির প্রাণে ঐ একই ঝড় তুললেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবিন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা বহুবিধ কবিতা, গানের সাহায্যে মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যে কারনেই হোক অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর যজ্ঞে তারা সেভাবে সাড়া দেননি। এই সময় একমাত্র নজরুলই কবিতা গানে মানুষকে দেশ সেবার মন্ত্রে উদ্বেলিত করেছিলেন।গান্ধীজীর আহ্বানে যখন সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন তিনি লিখলেন-

এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙ্গিনায়,
ত্রিশকোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।[১০]

অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি শুধু গানটি লিখেছিলেন তাই নয়, মিছিলে মিটিং এ গানটি গেয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত 'মরণ- বরণ' গানটি—

এস এস এস ওগো মরণ ।
এই মরণ ভীতু মানুষ মেষের ভয় করগো হরণ।[১১]

এই গানের মধ্য দিয়ে তিনি ভীতু মানুষ গুলোর ভয় দূর করার চেষ্টা করেছেন। যাতে তারা ঘরের মধ্যে না থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে ।এই সময় তাঁর কলম থেকে ঝড়েছিল একের পর এক জ্বালাময়ী গান ও কবিতা। যা নিপীড়িত মানুষের মনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ।'বন্দী-বন্দনা' তে লিখলেন—

আজি রক্ত নিশি ভোরে
একি শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে,
টুটুছে ভয় বাধা স্বাধীন হিয়াতলে।।[১২]

আন্দোলনের উত্তাল সময়ে নজরুল চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তি দেবির অনুরোধে 'বাংলার কথা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত 'ভাঙার গান'-

কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী
ওরে তরুন ঈশান,
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।[১৩]

কবির এই গানই মাতাল করে দিয়েছিল সমস্ত বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। তারা আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠেছিল। শৃঙ্খল মোচনের অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছিল। তাই বিপ্লবী দের মুখে মুখে ফিরেছে এই গান। সভা সমিতিতে ধ্বনিত হয়েছে এই গান। আন্দোলনকারিরা পায়ে পা মিলিয়েছে এই গানের তালে তালে। আসলে নজরুলের মত কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে প্রাণের জোয়ার বইয়ে দিতে পারেননি। কেউই তার মত উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারেনি –

ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি,
লাথি মার, ভাঙরে তালা,
যত সব বন্দী শালায়-
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল উপড়ি।[১৪]

তাইতো তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবীদের কাছের মানুষ । তাদের উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস। স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা বিপ্লবীদের বার বার হতাশার অন্ধকার থেকে নতুন করে জেগে উঠার প্রাণশক্তি যুগিয়েছিল এই ভাঙার গান।

১৯২১ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে সাপ্তাহিক 'বিজলি' তে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'। কবিতাটি তিনি এমন সময় রচনা করেন, যার কিছুদিন পরেই অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা জাতীয় জীবনে গভীর হতাশার সৃষ্টি করেছিল। অগনিত সংগ্রামী মানুষ গান্ধীজীর একটা সিদ্ধান্তে ভেঙ্গে পড়েছিল। ঘটনাটি হল, ১৯২২ খ্রিঃ ৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে পুলিশ থানায় আগুন লাগিয়ে দিলে ২২ জন পুলিশের মৃত্যু ঘটে। গান্ধীজী এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ফলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে হতাশার ঘোর অন্ধকার। সংগ্রামী মানুষগুলো ভবিষ্যতের পথ হারিয়ে ফেলেছিল। এই সময় 'বিদ্রোহি' জীবনের ডাক দিয়েছিল। হতাশাগ্রস্থ মানুষদের বুকে যুগিয়েছিল প্রাণশক্তি। সংগ্রামী মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হয়েছিল —বল বীর/ চীর উন্নত মম শির। মানুষকে তিনি শুনিয়েছিলেন বিদ্রোহের কথা —" আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল/ আমি দলে যাই যত বন্ধন, শত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল"।[১৫] তাঁর এই কবিতায় খোদা, ভগবান, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মশাস্ত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। বিদ্রোহী যেন প্রাণশক্তির জোয়ার নিয়ে এল সংগ্রামী মানুষের বুকে।এ প্রসঙ্গে এক আধুনিক কবি বলেছেন,- "একি শব্দ নি্মির্ত কবিতা, না মেশিনগানের অজস্র বুলেট?--- পুনরুক্তি হচ্ছে হোক যেন ঘোরের মধ্যে বলে যাওয়া এসব সংলাপ--- এ অভাগা কলহপরায়ণ দুবর্ল জাতির উদ্দেশ্যে কেউ কোনদিন বলেনি "বল বীর/ উন্নত মম শি্র, শুনলেই যেন রোমাঞ্চ জাগে"।[১৬] 'বিদ্রোহী' বাঙালি জাতির এক নতুন পরিচয় গড়ে দান করেছিল। সেই সঙ্গে সংগ্রামী মানুষদের চেতনায় তুলেছিল ঝড়। নজরুল জাতির মনে নিয়ে এলেন এক প্রাণশক্তির জোয়ার, আলস্যের ঘুম ভাঙিয়ে তাদের জাগিয়ে তুললেন। তাঁর প্রতিটা শব্দে ঝড়ে পড়ল বিস্ময়কর প্রাণোচ্ছাশ—"আমি দূর্বার / আমি ভেঙে করি সব চুরমার"।[১৭] এক নব চেতনায় আন্দোলিত হল গোটা সমাজ। তাঁর বিদ্রোহ শুধু উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, নিপিড়ণের বিরুদ্ধে। শোষিতের আতর্নাদ তার বুকে রক্ত ক্ষরণ ঘটাত। তিনি স্থীর থাকতে পারতেন না। তাই তিনি লিখেছিলেন---

মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না,[১৮]

এ কবিতা শুনে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নজরুলকে বলেছিলেন " তুমি হিন্দু মুসলিমকে মেলাতে পারবে। তুমি এই অসাধ্য সাধন করার জন্যই জন্মেছ বাংলাদেশে"।[১৯] রবিন্দ্রনাথঠাকুরও তার প্রশংসা না করে পারেননি। যাইহোক, 'বিদ্রোহ' বাঙালীর চেতনায় যে বিপ্লবের বীজ রোপণ করেছিল তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। 'বিজলি' পত্রিকায় এক সপ্তাহে ঊনত্রিশ হাজার কপি ছাপা হইয়েছিল। অন্যান্য পত্রিকায়ও এটি ছাপা হইয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় মানুষের মধ্যে কতটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল 'বিদ্রোহী' কে ঘিরে। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালিন ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে এলে ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাঁর আগমনকে ধিক্কার জানিয়ে জাতীয় কংগ্রেস সারা দেশ ব্যাপি হরতালের ডাক দেয়। এই সময় নজরুল কুমিল্লাতে ছিলেন। সেখানে প্রতিবাদ মিছিলের জন্য তিনি 'জাগরনী' নামে একটি কোরাস গান লিখেছিলেন। শুধু গান লিখেছিলেন তাই নয়, নিজের কাঁধে হারমোনিয়াম বেঁধে গান গাইতে গাইতে সারা শহর পরিক্রমা করেন।গানটির প্রথম কয়েটি লাইন হল--

ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও,
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী
সন্তান দ্বারে উপবাসী
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।[২০]

এই গানটির মধ্যে ভারতের পরাধীনতার লজ্জাই ধ্বনিত হয়েছে। তিনি দেশবসীর মধ্যে মানবতার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সুলতান মামুদ মজুমদার সেদিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তার "ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি" গ্রন্থে বলেন- কুমিল্লা রাজগঞ্জের কাছে গিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। মোগল টুলির দিকে চলেছি, এমন সময় থানা থেকে দারোগা সাহেব দুজন সিপাহী সহ আমাদের দিকে আস্তে থাকেন। তখন দলের বীর বাঙালীরা পালিয়ে কে কোথায় গেল ঠিক করতে পারলাম না। আমি যঃ পলইয়তি সঃ জীবতি নীতি অবলম্বন করে দ্রুত পায়ে পশ্চাতে হটে গেলাম--- সেই রাত্রে

নজরুলকে থানায় কাটাতে হইয়েছে। পরের দিন তারা কবিকে ছেড়ে দেয়।[২১] নজরুল রাস্তায় নেমে পুলিশ দেখে পালিয়ে যাননি, সাহসি যোদ্ধার মত গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাথর্তা ও ধূমকেতু : গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে এক গভীর হতাশা। দেশবাসী কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। ঠিক এই পটভূমিতে 'ধূমকেতুর' উদয়, যার সম্পাদক ছিলেন নজরুল। ফলে হতাশাগ্রস্থ জাতি তার কাছ থেকে পেতে চেয়েছিল জিবনীশক্তি। নজরুল তাদের ফেরাননি। তিনি সময়ের দাবিকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবিন্দ্রনাথঠাকুরও বোধহয় সেটাই চেয়েছিলেন। তাই 'ধূমকেতুর' উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন—

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ আগ্নি সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন,
অলক্ষনের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোকনা লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে,
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।[২২]

১৯২১ খ্রিঃ ১২ ই আগস্ট ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই সে তার পরিচয় দিয়ে দেয়— আমি যুগে যুগে আমি আসিয়াছি, পুনঃ মহাবিপ্লবহেতু
এই স্রষ্ঠার শনি মহাকাল ধূমকেতু।[২৩]

বাংলার বৌদ্ধিক গোষ্ঠী ধূমকেতুর এই আগমনকে অকৃপণ ভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। ধূমকেতুর প্রতিটা সংখ্যাতে থাকত দেশ, জাতি সম্পর্কে বিশেষ লেখা। অসহযোগ আন্দোলনের পর জাতি যখন দিকবিভ্রান্ত ও জাতীয় নেতারা যখন 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের' বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আস্তে পারছেন না তখন নজরুল ধূমকেতুতে লিখলেন, " সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতেরর পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক জন মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমানু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না । ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসণভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটুলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো ।আমাদের ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে"।[২৪] এ থেকে স্পষ্ট যে তিনি স্বরাজ নয়, চেয়েছিলেন স্বাধীনতা। সেই জন্য আবেদন নিবেদন নয়, গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই অধিকার অর্জন করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাই তিনি বলেছিলেন " সূতা দিয়া মোরা স্বাধীনতা চাই বসে বসে কাল গুণি/ জাগোরে জোয়ান বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি"।[২৫]

তিনি এমন একটা সময় একথা গুলি বলেছিলেন যখন প্রকাশ্যে 'পূর্ণ স্বাধীনতার' কথা বলতে কেউ সাহস পেত না। হয়তো কেউ কেউ গোপনে এই ইচ্ছে পোষণ করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহান উদুর্কবি ফজলুল হাসান হসরত মোহানী ১৯২১ খ্রীঃ আমেদাবাদে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধীবেশনের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলে কঠিন মামলায় জড়িয়ে পরেন এবং তার কারাদন্ড হয়। নজরুল শাস্তির ভয়কে তুচ্ছ করে দ্ব্যার্থহীন ভাষায় পূণর্স্বাধীনতার দাবি করেছিলেন। জাতীয় নেতারাও তখনও পর্যন্ত 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাসের' স্বপ্নেই বিভোর ছিলেন। গান্ধীজী নিজে বলেছিলেন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেলেই তিনি ইউনিয়নজ্যাক উড়িয়ে দেবেন।তখন নজরুলর পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি। বস্তুতপক্ষে, ভারতের জাতিয় কংগ্রেস এই দাবি করেছিল আরো অনেক পরে, ১৯২৯ খ্রিঃ লাহোর অধিবেশনে। এ প্রসঙ্গে মুজজফর আহমদ বলেছিলেন "নজরুলের মত আর কে স্বাধীনতার দাবিকে তুলে ধরেছিলেন আমার জানা নেই"।[২৬] আসলে নজরুল হতাশাগ্রস্ত মানুষদেরকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন 'ধূমকেতুর' মধ্য দিয়ে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংকটময় সময়ে নজরুল নিজের মত করে বিপ্লবের কথা শুনিয়েছিলেন ধূমকেতুর মধ্যদিয়ে। এ সম্বন্ধে সরকারের অভিমত ছিল " The policy of the paper as is evident from the articles written is one of the destroying all existing State of things and to embrace chaos and disorder"।[২৭] ধূমকেতুর তৃতীয় সংখ্যায় বলশেভিক মতবাদ এবং সন্ত্রাসবাদকে দ্বিধাহীন ভাবে সমর্থন করেছেন। এই সংখ্যাতেই তিনি লিখলেন তাঁর সেই বিখ্যাত সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'রুদ্রমঙ্গল'। এতে তিনি বললেন " জাগো জনশক্তি। মার মার করে ডেকে ওঠো হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ঠ কৃষক, আমার মুটে মজুর ভাইরা। তোমাদের হাতের লাঙল আজ বলরাম স্কন্ধে, হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, ঐ অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক উল্টে ফেলুক। আনো তোমাদের হাতুড় ভাঙো ঐ উৎপীড়নের প্রাসাদ…….. চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধরো তোমাদের বুকের রক্তমাখা লাল ঝাণ্ডা ।যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমাদের পায়ের তলায় আনো"।[২৮] এ থেকে বোঝা যায় তিনি সাম্যবাদী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার ভাবনা জাতীয়তাবাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তজার্তিকতাবাদের সীমা ছুঁয়েছিল। এই পত্রিকা সম্বন্ধে গোয়েন্দা শাখার অভিমত ছিল-" A bi-weekly newspaper openly preaching Bolshevism and urges the people

of Bengal to resort to violence"।[২৯] পৃথিবীর যেকোন স্থানে ব্রিটিশদের পতন তাকে উল্লসিত করত। তুরস্কের তরুণ বীর কামালপাশা তার দেশ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করলে নজরুল উল্লাসের সাথে লিখলেন-"ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই/ অসুর পুরে শোর উটেছে জোরসে সামাল সামাল তাই"।[৩০] তার এই ধরনের লেখা হতাশার মরা গাঙে নতুন জোয়ার এনেছিল। তাঁর কথায় "ভৃগুর মত বিদ্রোহী হও, ভগবান তোমার পায়ের ধূলো নেবে"।[৩১] কিশোর ও তরুণদের ওপর 'ধূমকেতুর' প্রভাব সম্বন্ধে বলা হল-" The whirlwind energy of the style and the inflammatory character of the language had great un-settling effect on pre-mature and ill-balanced minds with whom the paper was immensely regular"।[৩২]

নজরুলের আগুনঝরা লেখাগুলি ছিল বিপ্লবীদের কাছে প্রেরণার উৎস। ফলে বিপ্লবী নেতাদের সাথে তাঁর সখ্যতা ক্রমেই বাড়ছিল। ধূমকেতুর অফিসে বিপ্লবীদের আনাগোনা বাড়ছিল। একদিন বিপ্লবী বিপিন বিহারি গাঙ্গুলি ধূমকেতুর অফিসে এসে নজরুলকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এছাড়া আসতেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়। 'ধূমকেতুর' এই বাড়াবাড়ি যে সরকার সহ্য করবে না সেটাই স্বাভাবিক ছিল। বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব এই পত্রিকা সম্বন্ধে বলেছিলেন-" The Dhumketu will require very careful watching and we should prosecute on first opportunity…….I think it is important to nip this paper in the bud"।সরকারি এক নির্দেশ নামায় বলা হল-"Kazi Nazrul Islam has committed offences under section 124A of I.P.C in respect of publication of the three articles-1.Rudramangal, 2. Ulkapat, 3. Bjrabishan"।[৩৩] শেষ পর্যন্ত নজরুল রাজদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন। তার একবছর কারাদণ্ড হল। 'রাজবন্দীর জবানবন্দি' তে তিনি বলেছেন-"আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসিবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ"।[৩৪] তিনি আরো বলেছেন-" আমি পরম আত্মবিশ্বাসী, আর যা অন্যায় বলে বুছেছি, অত্যাচারকে অত্যচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,- আমি তোষামোদ করি নাই,-আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে"।[৩৫] যাইহোক, জেলখানায় রাজদ্রোহীদের প্রতি যেধরনের ব্যাবহার করা হয় নজরুলের প্রতিও সেই একি ধরনের ব্যাবহার করা হয়েছিল।বস্তুতপক্ষে, হুগলী জেলে তার উপর নারকীয় অত্যাচার করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি চুপ করে থাকেননি। কারাগারে জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তিনি ২৯ দিন অনশন করেছিলেন। অবশেষে ১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর নজরুল জেল থেকে ছাড়া পান।

সক্রিয় রাজনীতি ও নজরুল : জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নজরুল বাংলার রাজনীতিতে এক অভিনব মাত্রা যোগ করেন।তিনি এই সময় বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগ দিতে থাকেন। প্রতিটা সভায় তাঁর গান, কবিতা মানুষের মধ্যে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ১৯২৪ খ্রিঃ গান্ধীজীর সাথে তার প্রথম পরিচয় হয় হুগলীতে। তাঁর আগমন উপলক্ষে তিনি গান ও কবিতা রচনা করছিলেন। যদিও গান্ধীজীর আন্দোলন পদ্ধতির প্রতি তার আস্থা ছিল না। অতঃপর, ১৯২৫ খ্রিঃ নজরুল, কুতুবউদ্দিন আহমদ, হেমন্ত সরকার ও শামসুদ্দিন হুসেন প্রমুখের উদ্যোগে কলকাতায় কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত 'লেবার স্বরাজ দল' গঠিত হয়। মূলত সাম্যবাদী মতবাদ প্রচারের উদ্দেশে এই দল গঠিত হয়। এই দলের মুখপত্র হিসেবে 'লাঙল' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এর পরিচালক ছিলেন নজরুল। এই সময় তিনি সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত হল তার 'সাম্যবাদী' কবিতা—

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।[৩৬]

নিপীড়িত মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিলে নিচে ফেলে
চোখ ফেটে এল জল
এমনি করে কি জগত জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল।[৩৭]

তিনি কৃষকদেরকে সংগঠিত ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে লেখেন-

ওঠরে চাষি জগদ্বাসী ধর কসে লাঙল
আমরা মরতে আছি ভাল করেই মরব এবার চল।[৩৮]

নজরুলের লেখা আবার সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তারা নজরুলের উপর কড়া নজর রেখেছিল।যাইহোক, লেবার স্বরাজ দলের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে তার রাজনীতিতে হাতে খড়ি। ১৯২৬ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগরে তার উদ্যোগে 'নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই লেবার স্বরাজ দলের নাম বদলে রাখা হয় " The Bengal Peasants And Workers Party"। পরে অবশ্য এর নাম হয় 'The Workers' And Pasants' Party of Bengal'। দলের নাম বদলের সাথে,তার মুখপত্র 'লাঙলের' নাম বদল করে রাখা হল 'গণবাণি'।নজরুল জাতীয় কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। মুজফফর আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন-" ১৯২৬ সালে আমি দেখেছি যে নজরুল ইসলাম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সভ্য"।[৩৯] এই সময় কৃষ্ণনগরে তিনটি সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন

ও যুব সম্মেলন। এই সম্মেলন গুলির জন্য নজরুল অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং নিজে সুর দিয়ে সেই গান গেয়েছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মলেনের জন্য তিনি লিখেছিলেন 'কান্ডারি হঁশিয়ার'-" দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার/ লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হঁশিয়ার"।[৪০]

ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গঠনে 'লাঙল' ও 'গণবাণী'-র ভূমিকা ছিল অপরিসীম। নজরুলই প্রথম এই দুই পত্রিকার মাধ্যমে শ্রমিক ও কৃষকদের ম্লান মুখে প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়েছিলেন। শ্রমিকদের উদ্দেশে বললেন-

ঘুমঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল দেহমন বেঁধে করেছে বিকল।
ঝেড়ে ফেলে যা, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির বারি,
উহারা কজন, তোরা অগণন সকল শক্তিধারী।[৪১]

কৃষকদের উদ্দেশে লিখলেন-

আজ জাগরে কিষান, সবতো গেছে কিসের বা আর ভয়
এই ক্ষুধার জোরেই করবো এবার সুধার জগত জয়।[৪২]

কৃষক, শ্রমিকদের যন্ত্রণা তাঁকে ব্যাতিত করেছিল। তিনি যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের বুকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ছন্নছাড়া মানুষ গুলোকে সংঘবদ্ধ করার জন্য, তাঁর মূল অস্ত্র ছিল গান ও কবিতা। তাঁর এইসব কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল সাম্যবাদী চিন্তাধারা। স্বভাবতই এই সময় কবি যেখানেই যেতেন, সেখানেই থাকত ছদ্মবেশী পুলিশ বা পুলিশ প্রতিবেদক। তাদের কাজ ছিল নজরুল কোথায় কি আবৃতি করছেন, গান গাইছেন বা বক্তব্য রাখছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদন গোয়েন্দা দপ্তরে পাঠান। বিস্ময় লাগে একজন কবির প্রতি সরকারের এতটা উদ্বিগ্নতা দেখে। তৎকালীন সময়ে কোন চরমপন্থি নেতা ছাড়া কারোর প্রতি সরকার এতটা উদ্বিগ্ন ছিল না। আসলে ব্রিটিশ সরকার ভয় পেয়েছিল তাঁর সাম্যবাদী মতাদর্শকে, যা এই সময় তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল। অথচ সাম্যবাদী মতবাদের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল না। সাধারণ নিপীড়িত মানুষের মঙ্গল কামনা ছিল তাঁর হৃদয়লব্ধ অনুভূতি মাত্র। যাইহোক সরকার নানা ভাবে কবির কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চেয়েছিল । আর এই জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিল তাঁর একের পর এক কাব্যগ্রন্থ, যেমন- যুগবাণি, বিষের বাশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা। এই গ্রন্থ গুলির কালো অক্ষরে নিহিত ছিল আগুন, যা পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে। প্রতিটি ছত্রেই ছিল তীব্র মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, যা মূক বধির কেউ জাগিয়ে তুলেছিল। যাইহোউ, ১৯২৯ খ্রিঃ পর নজরুল রাজনীতি থেকে সরে আসেন এবং সুরের রাজ্যে প্রবেশ করেন।

উপসংহার : পরাধীন ভারতের এক সংকটময় পরিস্থিতিতে নজরুল সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় জীবনে তখন এক বুক হতাশা । গান্ধীজীর আহ্বানে দেশ উত্তাল হয়ে উঠল। শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। নজরুলও সময়ের দাবী মেনে, ধরলেন কলম। ঝড়ে পড়ল একের পর এক আগুন ঝড়ানো গান ও কবিতা। নিপীড়িত, শোষিত মানুষ পেল প্রতিবাদের ভাষা, শৃঙ্খল ভাঙার পেরণা, ঔপনিবেশিক শক্তিকে উৎখাতের সাহস। তাঁর প্রতিটা শব্দ আজস্র বুলেট হয়ে ঝড়ে পড়ল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বুকে। শোষিত, নিপীড়িত মানুষ দেখল এক জ্বলন্ত ধূমকেতুকে। যে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে। ভেঙে দিতে চায় শোষন, অত্যাচার ও অসাম্যের বেড়াজালকে। গড়ে তুলতে চায় এক শোষনহীন স্বাধীন সমাজ। নজরুল জীবনে অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি কখনো। তিনি চেয়েছিলেন ঘুমন্ত মানুষগুলিকে জাগিয়ে তুলতে। তাই তিনি বলেছিলেন " আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মতো হয়তো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বিস্ময় থাকবে না বেশীদিন। ধূমকেতু যেমন সহসা আসে তেমন সহসা চলে যায়।.....আমি ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেলাম.....”।[৪৩] সত্যিই তিনি পরাধীন জাতীর ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পেরেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন তিনি আন্দোলনকারীদের বুকে যুগিয়েছিলেন সাহস ও প্রাণশক্তি। আন্দোলনের ব্যার্থতার পর দেশবাসী যখন হতাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল তখনও তিনি গেয়েছিলেন নতুন জীবনের গান, নব উদ্যমের গান। হতাশার মরা গাঙে এনেছিলেন প্রানের জোয়ার। তাই তার কবিতা, গান মিটিং, মিছিল, ধর্মঘটে মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। অগণিত মানুষকে শক্তি যুগিয়েছে। যুগিয়েছে সাহস আর লড়াইয়ের প্রেরণা। সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তাঁর কণ্ঠ রোধ করতে পারেনি। নিজ জীবনের যন্ত্রণা ভুলে সৃষ্টি করেছেন বিপ্লবের মন্ত্র। আজও তাঁর প্রতিবাদী ভাষা নিপীড়িত মানুষকে প্রতিবাদের শক্তি যোগায়।

তথ্যসূত্র :

১. খান আজাহারউদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলামের নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লী, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃঃ ৭৬
২. আহমদ মুজফফর, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃঃ ৩০
৩. মুখোপাধ্যায় মানিক (সম্পাদিত), চির উন্নত শির,সারা বাংলা নজরুল শতবর্ষ কমিটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০১, পৃঃ ৪১
৪. আহমদ মুজফফর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫
৫. তদেব, পৃঃ ৩৬
৬. তদেব, পৃঃ ৩৬

৭. তদেব, পৃঃ ৩৭
৮. তদেব, পৃঃ ৩৭
৯. তদেব, পৃঃ ৩৮
১০. তদেব, পৃঃ ৮১
১১. তদেব, পৃঃ ৮২
১২. তদেব, পৃঃ ৮৩
১৩. খান আজহারউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২
১৪. তদেব, পৃঃ ৪৩
১৫. ইসলাম নজরুল, অগ্নিবীণা, ডি এম লাইব্রেরী, ৩৫তম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃঃ ১২
১৬. মিত্র উদয়ন, রাজশক্তি ও ধূমকেতুর কবি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২, পৃঃ ১৬
১৭. ইসলাম নজরুল, অগ্নিবীণা, পৃঃ ১৪
১৮. তদেব, পৃঃ ১৬
১৯. মুখোপাধ্যায় মানিক(সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২
২০. মিত্র উদয়ন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৭
২১. মুখোপাধ্যায় মানিক (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭
২২. আহমদ মুজফফর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯
২৩. ইসলাম নজরুল, অগ্নিবীনা, পৃঃ ২৪
২৪. আহমদ মুজফফর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬০,১৬১
২৫. মুখোপাধ্যায় মানিক (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭
২৬. আহমদ মুজফফর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১
২৭. মিত্র উদয়ন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪
২৮. তদেব, পৃঃ ৩৫
২৯. তদেব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩
৩০. ইসলাম নজরুল, অগ্নিবীনা, পৃঃ ২৮
৩১. মিত্র উদয়ন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫
৩২. তদেব, পৃঃ ৩৩
৩৩. তদেব, পৃঃ ৪৭
৩৪. খান আজহারউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯
৩৫. তদেব, পৃঃ ৩০
৩৬. তদেব, পৃঃ ৫১
৩৭. তদেব, পৃঃ ৫৯
৩৮. তদেব, পৃঃ ৬৮
৩৯. আহমদ মুজফফর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬
৪০. তদেব, পৃঃ ১৯৮
৪১. মিত্র উদয়ন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১
৪২. খান আজহারউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮
৪৩. মিত্র উদয়ন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭

*****